***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's***
*Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 27 – 34*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com*
*(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848*

# বৈষ্ণবীয় ভাবনায় আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন

ড. অমিত দে
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কাশীপুর মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয়
কাশীপুর, পঞ্চকোটরাজ, পুরুলিয়া
Email ID : amitdey500@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

## Keyword

Vaishnab literature, Bengali literature, Intellectual essayist, Vaisnab culture, Mahaprabhu, Devotion and passion.

## Abstract
Dinesh Ch. Sen was a great scholar of Bengali language & literature. He was an eminent researcher and a intellectual essayist. We all know that Vaishnab Literature had a great role in Medieval Bengali Literature. After appearance of great Mahaprabhu, Vaishnab literature has changed significantly and the scenario of the whole Bengali Literature has changed. So in the path of vaishnab philosophy and literature there are a long list of researcher and scholars. Acharya Dinesh Ch Sen was one of them. He is not only a Researcher, with his devotion and passion he reached the Vaishnab literature in a height. He wrote many books in English language regarding Vaishnab literature and great chaitanyadev. His two books "The Vaishnava Literature of Medieval Bengal" (1917) and "Chaitanya and his Companions" (1917) are the greatest work in English language. Thus he sprayed vaisnab culture and Bengali literature to the abroad.

## Discussion
বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালি জাতির প্রাণের সম্পদ বৈষ্ণব পদাবলী বা মহাজন পদাবলী। প্রাক চৈতন্য এবং চৈতন্য উত্তর যুগে বৈষ্ণব পদাবলীর এক বিদ্যাপতি ব্যতীত (কবি জয়দেবকেও বিতর্কের ঊর্ধ্বে গিয়ে বাঙালি বলে স্বীকার করা হল) প্রায় সব পদকর্তারাই ছিলেন বাঙালি। ফলে উত্তর ভারতের দুজন পৌরাণিক চরিত্র– রাধা এবং কৃষ্ণ এই বাঙালি পদকর্তাদের লেখনীতে এক নবরূপ লাভ করলেন। পদকর্তারা 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' এই দুজনকে বড় আদর যত্নে নিজের আত্মার পরমাত্মীয় করে নিয়েছেন। ফলে শুধু সাহিত্যেই নয় বাঙালি জীবনেও বৈষ্ণবীয় ভাবের অবদান অনস্বীকার্য।

বৈষ্ণব পদকর্তারা এতদিন ধরে বাঙালি মানসে তৈরি করলেন প্রেমভক্তির উপত্যকা আর চৈতন্যদেব সেই উপত্যকায় বয়ে আনলেন ভাবের প্লাবন। যে প্লাবনে সামাজিক দ্বন্দ্ব, বৈষম্য একে একে ভেসে গেল, মিলিয়ে গেল।

ঐতিহাসিকদের মতে এই ঘটনা বাংলার ভক্তি আন্দোলন। এই আন্দোলনের অস্ত্র কৃষ্ণনাম এবং কৃষ্ণপ্রেম। তাই 'প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বাংলাদেশে'। চৈতন্যদেবের আগমন সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেনের এই প্রশংসা অত্যুক্তি নয়, তা রসজ্ঞের উক্তি।

বাংলা সাহিত্যের এই অমূল্য সম্পদকে সঙ্কলিত ভাবে সর্বসমক্ষে পরিবেশন করার জন্য বহুদিন ধরে বেশ কিছু বাঙালি গবেষক এবং অনুরাগী মনস্বী ব্যক্তি প্রচেষ্টা করেছেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য কুমিল্লার গভর্নমেন্ট স্কুলের হেডমাস্টার জগতবন্ধু ভদ্র। সাহিত্য সমাজে যদিও তিনি 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্যারডি 'ছুছুন্দরী বধ' কাব্যের রচয়িতা রূপে সুপরিচিত। পূর্ববঙ্গে তৎকালীন ইংরাজি ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন উমাচরণ দাস। জগতবন্ধু বাবু এই উমাচরণ দাসের সাহায্য নিয়ে সর্বপ্রথম চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ প্রকাশ করেন। জগতবন্ধু বাবুর আগে শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি বরং একটা তীব্র ঘৃণার ভাব ছিল। এর মূল কারণ তত্ত্ববোধনী পত্রিকায় 'বংশীধর'(নামান্তরে শ্রীকৃষ্ণ) প্রসঙ্গে অবাধ ঠাট্টা বিদ্রূপ। জগতবন্ধু বাবু প্রথম বহু বাবাজীর আখড়াতে ঘুরে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সমস্ত পদ সংগ্রহ করে ছিলেন। তাঁর এই উদ্যগের পর সারদা মিত্র, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, রমণী মল্লিক, অক্ষয়চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, নীলরতন, নগেন্দ্র গুপ্ত, সতীশ রায়, অমৃতবাজার পত্রিকার অধ্যক্ষেরা প্রমুখ এ বিষয়ে উৎসাহী হয়েছিলেন। জগতবন্ধু বাবুর অসাধারণ সংগ্রহ-নৈপুণ্য ও বিরাট অধ্যবসায়ের অপর নিদর্শন 'গৌরপদতরঙ্গিণী' গ্রন্থ যা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন ছিলেন এই জগতবন্ধু বাবুর স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। সুতরাং একথা সহজেই অনুমেয় যে পরবর্তী জীবনে বৈষ্ণবীয় ভাবের প্রতি আচার্য সেনের আকর্ষণের সূত্রপাত এই সময় থেকেই। দৈব নির্ভরতা এবং ঈশ্বরের প্রতি শরনাগতি আচার্য সেনের জীবনে প্রথম থেকেই দ্রষ্টব্য। তাঁর কথানুযায়ী –

> "সকলেরই ইচ্ছা-অনিচ্ছায় পূর্ব-নির্দিষ্ট পথ ভাঙিয়া চুরিয়া-তিনি এইভাবে অপরিহার্য কর্মসূত্রের নিয়মে সকলকে স্বতন্ত্র এক পথে সরাইয়া-টানিয়া লইয়া যান, ইহাকেই 'দৈব' বলে।"[১]

এই সমর্পণের ভাবনার দ্বারাই দীনেশচন্দ্র সেন বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন বলে আমার মনে হয়।

এই গবেষণাপত্রে দীনেশচন্দ্র সেনের চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রাধা সম্পর্কে কিছু মৌলিক ধারণা এবং তাঁর লেখা কয়েকটি বৈষ্ণবীয় প্রসঙ্গ সম্বলিত বইয়ের আলোচনার মাধ্যমে তাঁর বৈষ্ণবীয় ভাবনাকে দেখানো হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেনের বৈষ্ণব ভাবনায় চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রাধার তুলনামূলক প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রাধা সম্পর্কে প্রচলিত ধারনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি/ রায়ের নাটকগীতি/ কর্নামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ'[২] – বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডীদাসের নাম অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। দুজনেই প্রাক চৈতন্য যুগের কবি। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে দুজনেই পদরচনা করেছেন। কিন্তু উভয়ের কবিসত্তার পার্থক্য যথেষ্ট।

বিদ্যাপতি রাজসভার কবি; বিদগ্ধ কবি। নানা শাস্ত্রে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। তাই তাঁর রচনায় নাগরিক বাকবৈদগ্ধ, মণ্ডনকলা, নাগরিক জীবনের চাকচিক্য, ভাষার ঐশ্বর্য, অলংকারের মাধুর্য লক্ষণীয় বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছে। অন্যদিকে চণ্ডীদাস বাসুলীর এক দীন সেবক। তাই তাঁর কবিধর্ম সহজ ও সরল ভাবের। বিদ্যাপতির রাধার একটি ক্রমবিকাশ আছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার কোন ক্রমবিকাশ লক্ষ করা যায় না। পূর্বরাগ ও আত্মনিবেদন চণ্ডীদাসের রাধার কাছে সমান কথা। কিন্তু বিদ্যাপতির রাধা রতি থেকে আরতির দীপশিখা হাতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিদ্যাপতি শিল্পী কবি অন্যদিকে 'চণ্ডীদাস কবিতাপস'। বিদ্যাপতির রাধা প্রকৃতির পটভূমিকায় কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলেন – 'ফাটি যাওত ছাতিয়া'। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা তা করেন না। তিনি বলেন– 'আমার পরাণ যেমতি করিছে/তেমনি হউক সে'। তাই চণ্ডীদাসের রাধা মিলনেও সুখ অনুভব করেন না। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে –

> "চণ্ডীদাসের বর্ণিত রাধা এবং বিদ্যাপতির রাধা – দুইটি ভিন্ন সামগ্রী। একজন সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের ভাণ্ডার হইতে সাজসজ্জা আনিয়াছেন – অপরা বঙ্গদেশের ভক্তি ও ভাবসম্পদের মূর্তি। একজনের অপাঙ্গদৃষ্টি, যৌবনোদ্গম, রহস্যপ্রিয়তা, এমন কি অব্যক্ত অস্ফুট কোরকের ন্যায় অধরপ্রান্তের হাসিটুকুও অলংকারশাস্ত্রের

> নিয়মানুযায়ি – সামান্য নায়িকার লক্ষণাক্রান্ত। অপরার বসনাঞ্চল ধূলায় লুণ্ঠনশীল, তাঁহার নায়কের মনচোরা অপাঙ্গদৃষ্টি নাই, ধ্যানশীলার ন্যায় মুগ্ধ ঊর্ধ্ব দৃষ্টি। তিনি সমস্ত অলংকার খুলিয়া ফেলিয়া প্রেমের আবেশ দেখাইতেছেন, "বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসিয়া পড়ে"। তিনি আবদ্ধ বেণী মুক্ত করিয়া চম্পকমাল্য খসাইয়া ফেলিয়া স্বীয় কুন্তলদামের কৃষ্ণ-শোভা নিরীক্ষণ করেন। ময়ূরময়ূরীর-কণ্ঠে সেই কৃষ্ণোজ্জ্বল স্নিগ্ধ বর্ণ, মেঘেও সেই কৃষ্ণবর্ণ, আজ তাঁহার এলায়িত কৃষ্ণকুন্তলেও তাহাই, সুতরাং নিজদেহে এবং বাহিরে তিনি কৃষ্ণকে খুঁজিয়া আবিষ্কার করিয়া ধন্যশীলা।"[৩]

চৈতন্য আবির্ভাবে এই বৈষ্ণব সাহিত্যে জোয়ার এসেছিল। এই সময়ে নানা কবি চৈতন্যদেবের নব আদর্শে বৈষ্ণব পদরচনা শুরু করেন। প্রাক্ চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব পদকর্তাদের আদর্শ ছিল– ঐশ্বর্য ভক্তি, কিন্তু চৈতন্য আবির্ভাবে তা পরিণত হল মধুর ভক্তিতে। শুধু তাই নয়, রাগানুগা ভক্তির দ্বারা প্রভাবিত হল বৈষ্ণব সাহিত্য। প্রাক্ চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব কবিদের আদর্শ ছিল ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র কিন্তু চৈতন্য আবির্ভাবে চৈতন্য হলেন চৈতন্যযুগে ও তার পরবর্তী যুগে বিশেষ আদর্শ। চৈতন্যপূর্ব যুগের সম্ভগাত্মক প্রেম চৈতন্য আবির্ভাবে শৃঙ্গার রসে পরিণত হল। কারণ চৈতন্য ছিলেন শৃঙ্গার রসরাজ। যেখানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমে আধ্যাত্মিকতা ছিল না চৈতন্য আবির্ভাবে এক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতা এলো। চৈতন্য সমসাময়িক কবিরা চৈতন্যের সান্নিধ্যে এসে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞাতা দিয়ে মানবিক রস সমৃদ্ধ পদ রচনা করলেন। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে -

> "বঙ্গদেশের প্রেমের বইয়ের একপিঠে রাধা, আর এক পিঠে গৌরাঙ্গ। একজন প্রেম-সাধনা দীপ্ত কল্পনায় দৃষ্ট মানসী প্রতিমা, আর একজন সহস্র ভক্তকণ্ঠের জয় জয় শব্দে অভিনন্দিত, খোল-করতাল-সঙ্গীত-বন্দিত ঐতিহাসিক চিত্র। সাধনারাজ্যের এই দুইখানি চিত্রপট। যে ব্যক্তি শতদলকে লক্ষ না করিয়া তাহার নীচের পাঁক দেখিয়া ফিরিয়া যায়, সে নিতান্তই হতভাগ্য; তাহার আলোচনার মসীতে সে নিজে কলঙ্কিত হয় মাত্র; কিন্তু পদ্মের নিশ্বাস–সুরভি তাহার ভাগ্যে লাভ হয় না।"[৪]

কবিদের ক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্র সেনের পক্ষপাতিত্ব চণ্ডীদাসের প্রতি একটু বেশী। নিঃসন্দেহে চণ্ডীদাস বৈষ্ণব সাহিত্যের এক সুবিস্তৃত রাজ্য অধিকার করেছেন তথাপি আমার মনে হয় চণ্ডীদাসের দ্বারাই বিশেষভাবে দীনেশচন্দ্র সেনের বৈষ্ণবীয় চেতনা সমৃদ্ধ। তাঁর বক্তব্য অনুসারে –

"ফিরিয়া ফিরিয়া চণ্ডীদাসের গানের দিকে সমস্ত প্রাণ উন্মুখ, উৎকণ্ঠিত হইয়া ছুটিত। কোথায় গেল আমার টিন্টার্ন অ্যাবি, এমন কি এত সাধের 'চীনাংশুকমিবকেতোঃ'। কখনও পড়িতাম – 'অবলা এমন তপ করিয়াছে কবে?' কৃষ্ণ স্বয়ং পরশমণি, যাহা শ্রীকরে ছুঁইয়া ফেলেন, তাই তো সোনা হইয়া যায়, তবে "কি লাগিয়া ধরে সখি চরণে আমার" তিনি "একবার যাই" বলিয়া আমায় কত আদর করেন, বারংবার বিদায় চান – অর্ধপদ যাইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া কাতর হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন, আমার হাতে হাত রাখিয়া শপথ দেন যেন আবার দেখা হয়, পুনরায় দেখা পাওয়ার অনুমতির জন্য কত মিনতি করেন –

"পদ আধ যায় পিয়া চায় পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া
করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মরে।
পুন দরশন লাগি কত চাটু বলে।"

এই সকল কবিতা সকালে-বিকালে পড়িতাম, দিনরাত্র পড়িতাম, এই কবিতাগুলি নিরজনে একা একা আওড়াইয়া আনন্দ পাইতাম।"[৫]

এর একমাত্র কারণ হল - চণ্ডীদাসের পদাবলীর রাধা এক সূক্ষ্মভাবের জ্যোতির্ময়ী বিগ্রহ। জন্ম থেকেই তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী। জন্মজন্মান্তরে তিনি কৃষ্ণগতপ্রানা। জাগতিক অনুভূতির ঊর্ধ্বে আধ্যাত্মিক জগতের অভিযাত্রী। তাই চণ্ডীদাসের রাধা চরিত্রে কোন ক্রমবিকাশ নেই। পূর্বরাগ, অনুরাগ, বিরহ ও মিলন প্রভৃতি বিচিত্র পর্যায়ের কবিতা চণ্ডীদাস লিখলেও সব পদেই প্রেমানুভূতিতে বিরহ প্রবল। বয়সের দিক থেকে রাধা ক্রমবিকশিত নন। তার যৌবনধর্ম দেহধর্ম ও ইন্দ্রিয়বোধ নয় – হৃদয়ের এক গভীর কৃষ্ণ-ব্যাকুলতায় রাধার প্রধান পরিচয়। রাধা তাঁর সব বাসনা কামনা ও

সৌন্দর্য চেতনা মিশিয়ে কৃষ্ণকে তৈরি করেছেন। কৃষ্ণ তার মনের মানুষ। কৃষ্ণনাম জপ করতে করতে তাঁর প্রাণ অবশ হয়ে যায় – তিনি প্রণয় মিলন ও প্রণয় বিরহের এক অপূর্ব সৌন্দর্যময় রোম্যান্টিক রাজ্যে হাজির হন। রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের পদাবলী আলোচনা করতে গিয়ে রাধার প্রেম সাধনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, চণ্ডীদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি – এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি।

সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের অনুরাগী হিসেবে দীনেশচন্দ্র সেনের ভাবনায় চণ্ডীদাস যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবেন একথা স্পষ্ট।

সাহিত্যের কথা ব্যাতিরেকে বলা যেতে পারে দীনেশচন্দ্র সেনের ব্যক্তি জীবনেও বৈষ্ণবীয় ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তাঁর লেখা 'ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য' বইটিতে বহু যায়গায় তিনি তাঁর ঐশ্বরিক নির্ভরতার কথা বিশেষ করে ইশ্বরের প্রতি শরণাগতির কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন। প্রাসঙ্গিক ভাবেই বলা যেতে পারে তাঁর তিনি কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পুথি সন্ধানে তৎপর হয়েছিলেন। তাঁর কথানুসারে –

> "এই চণ্ডীদাসের পুঁথি হাতে করিয়া চন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থের সনির্বন্ধ অনুরোধে, কৈলাসবাবুর উৎসাহে-আমার অন্তরের দেবতা যে পূজা চাহিতে ছিলেন, তাহার নৈবেদ্য তৈয়ারী করার আন্তরিক ইচ্ছায় আমি পুঁথি সংগ্রহে বাহির হইয়া পড়িলাম।"[৬]

দীনেশচন্দ্র সেনের ব্যক্তিজীবন ঘটনাবহুল। পারিবারিক সুখ বা স্বাচ্ছন্দ্য বলতে যা বোঝায় তিনি কোনদিনই তার অনুভব করেননি। চাকরীসূত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন যায়গায় বদলী হয়েছেন। দীর্ঘজীবনে তিনি অভিজ্ঞতা এবং মানসিক বেদনা দুই-ই সঞ্চয় করেছেন। যদিও তাঁর বিপুল সাহিত্যকর্ম দেখে আমাদের সে কথা বোঝার উপায় নেই। নিজের জীবিতাবস্থায় সন্তানের মৃত্যু, স্ত্রীর অসুস্থতা, নিজের দুরারোগ্য ব্যাধি এই সমস্ত কিছু নিয়েই তাঁর জীবনের পথ চলা। তবুও সঙ্কটে-সম্পদে, পাওয়া-না পাওয়ায় তাঁর একমাত্র সম্বল বলতে ছিল হরি নাম ও শরণাগতি। তাঁর কোথায়–

> "কখনও দুশ্চিন্তায় দুঃখে মন উতলা হইত; মাখন, কিরণ ও অরুণের মুখ মনে পড়িয়া চক্ষে জল আসিত, তখনই ফিট হইত। কিন্তু সেই বিপদে আমি ভগবানের নাম আশ্রয় করিয়া রহিলাম। আমার স্ত্রীপুত্র নাই, আমার পিতামাতা নাই। বিশাল আলেখ্য হইতে বহুদিনের আঁকা স্নেহমমতার নানা রঙে ফলানো সমস্ত ছবি যেন মুছে গিয়া বিশাল শূন্য পটে শুধু এক হরিনাম আঁকা রহিল, অন্য সমস্ত দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া সেই দিকে বদ্ধ-লক্ষ্য হইয়া রহিলাম। অসহ্য সাংসারিক যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে আমি কোন চিন্তা করিতাম না। চিন্তা ছাড়া চিন্তা দূর করিতে পারিলাম না, চিন্তাজালে আরও জড়াইয়া পড়িতাম, পীড়া বাড়িত, ফিট হইত। নিজের শক্তি দ্বারা মনকে প্রকৃতিস্থ করিবার শক্তি হারাইয়াছিলাম, তাহা বুঝিতে পারিতাম। শিশু যেমন ভয় পাইলে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরে, আমি সেইরূপ উপায়হীন হইয়া নামকে আশ্রয় করিয়াছিলাম।"[৭]

তাঁর রচিত বৈষ্ণব সাহিত্য ও চৈতন্য পরিকর বিষয়ক দুটি ইংরাজি বই তাঁর এই ভগবৎভক্তিরই অন্যতম নিদর্শন।

তাঁর রচিত কিছু কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক বইও এ বিষয়ে সমর্থনযোগ্য। বাংলায় রচিত এই বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– রাগরঙ্গ (১৩২৬ বঙ্গাব্দ), কানু-পরিবাদ ও শ্যামলি-খোঁজা, মুক্তাচুরি (১৯২১), রাখালের রাজগি (১৯২০খ্রিঃ), সুবলসখার কাণ্ড (১৯২২খ্রিঃ)।

'রাগরঙ্গ' নামক বইটিতে দীনেশচন্দ্র সেন রাধাকৃষ্ণের মান বিষয়ক লীলামাধুর্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। বইটি উৎসর্গ করেছেন অধ্যাপক নীলরতন সরকার মহাশয়কে। 'নারী জনমে হাম না করিলু ভাগি।/এখন মরণ শরণ ভেল মানকি লাগি'- বিদ্যাপতির এই পদকে সামনে রেখে দীনেশচন্দ্র তাঁর গ্রন্থারম্ভ করেছেন।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে রসের ব্যাখ্যায় পঞ্চরসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে 'মধুর রস'কে। মধুর তথা উজ্জ্বল বা শৃঙ্গার রস চতুর্ধা বিভক্ত, সেখানে পূর্বরাগের পরই মানের স্থান। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে 'মান' সম্বন্ধে বলা হয়েছে –

> "সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
> রতি গাঢ় হইলে পড়ে প্রেম নাম কয়।।

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's*
*Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-04*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 27-34*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

প্রেম বৃদ্ধিক্রমে স্নেহ মান প্রণয়।"

মানের দুটি বিভাগ – উদাত্ত মান এবং ললিত মান। উদাত্ত মানকে বলা হয় ঘৃতস্নেহজাত-এতে থাকে তদীয়তাময় ভাব, অর্থাৎ 'আমি তোমার'। অপর ভাব ললিত মানকে বলা হয় মধুস্নেহজাত-এতে থাকে মদীয়তাময় ভাব অর্থাৎ 'তুমি আমার'। 'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা' য় বলা হয়েছে –

"স্নেহের উৎকর্ষে হয় মাধুর্য নূতন।
তাথে অদাক্ষিণ্যে মান কহে বুধগণ।।"

এই মানের স্বরূপ গদ্যের আকারে দীনেশচন্দ্র সেন পরিবেশন করেছেন তাঁর 'রাগরঙ্গ' নামক বইটিতে। তাঁর কথায় –

> "আমি রাগরঙ্গ উপলক্ষে ভগবানের সঙ্গে মানুষের মান-অভিমানের পালাটা কিরূপে চলতে পারে, তার আভাস দিতে চেষ্টা করেছি। এই পুস্তকেও আমি চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, কৃষ্ণকমল প্রভৃতি মহাজনের পদাঙ্ক দেখে চলতে চেষ্টা করেছি।"[৮]

'কানু-পরিবাদ ও শ্যামলী খোঁজা' মূলত কৃষ্ণের উত্তর এবং পূর্বগোষ্ঠের লীলা বর্ণনার নিদর্শনস্বরূপ। সেখানে গোষ্ঠলীলা কালীন দেব গোষ্ঠ, কানাই রাজা, অঘাসুর বধ প্রভৃতি লীলা বর্ণনা স্থান পেয়েছে। পরের অধ্যায়ে ভাগবতের কথা এবং মাঝে কিছুটা অধ্যায় জুড়ে পূর্বরাগের আভাস রয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে -

> "কানু-পরিবাদ পালাটি কীর্তনের পূর্ব-গোষ্ঠ। গৌরদাস, শিবু, গনেশ প্রভৃতি কীর্তনিয়াদের মুখে এই পূর্ব-গোষ্ঠের পালা যিনি শুনেছেন, তিনি অবশ্যই স্বীকার করবেন যে এই পালা আনন্দের মুক্ত পরিবেষণ স্বরূপ। ...বৃন্দাবণ যে আনন্দলোক, তা গৌরদাস, গানে গানে ও আখরে আখরে যেন এঁকে আমাদের ভুলিয়ে দেন যে আমরা এই টাকাকড়ির হিসেবনিকেশে ব্যস্ত, ক্ষণিক সুখ-দুঃখ-মত্ত মরজগতের জীব।"[৯]

পরবর্তী গ্রন্থ 'মুক্তাচুরি' প্রকাশিত হয় ভারতী পত্রিকায় ১৯২১ খ্রিঃ। গ্রন্থটি দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উৎসর্গ করেছেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে। এই গল্পের আখ্যানবস্ত দীনেশচন্দ্র 'মুক্তালতাবলি' নামক একটি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন। কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর পরিচয় দিতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন-

'...যে চরিত্রগুলির প্রসঙ্গ লেখা হয়েছে, ২০/২৫ বৎসর পূর্বে বাঙালি হিন্দু মাত্রেই তাঁদের কথা জানতেন। কিন্তু আজকাল ঘরের কথা আমরা যেরূপ দ্রুতভাবে ভুলে যেতে চলেছি, তাতে চরিত্রগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ হচ্ছে।

এই পুস্তকে কৃষ্ণের সাতটি সখার কথা উল্লেখ করেছি, যথা–বসুদাম, সুদাম, শ্রীদাম, অংশুমান, মধুকণ্ঠ, মন্দার ও মধুমঙ্গল। প্রথমোক্ত তিনটি সম্বন্ধে 'রাধাতন্ত্রে' লিখিত আছে–'অথ প্রিয়সখা দামসুদামবসুদামকাঃ। শ্রীদামাদ্যাঃ সদা যত্র শ্রীদামানন্দবর্ধকাঃ।।' (২০ পটল, ১৬/১৭ শ্লোক) এবং মধুকণ্ঠ সম্বন্ধে '...মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ। তদ্বেণুশৃঙ্গমুরলী - যষ্টিপাশাদিধারিণঃ।' (২০ পটল, ২২ শ্লোক), এবং মন্দারের কথাও ২০ পটলে উল্লিখিত হয়েছে। অংশুমান সম্বন্ধে অনেক স্থলেই উল্লেখ আছে; যথা মহাজনপদে-'আওয়ে শ্রীদামচন্দ্র রঙ্গিয়া পাগুড়ি মাথে। স্তোক অর্জুন অংশুমান দাম সুদাম সাথে।' মধুমঙ্গল সখাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছিলেন। এজন্য দেখা যায়, গোপীদের ব্রাহ্মণভোজন করাবার দরকার হলেই কৃষ্ণসখা মধুমঙ্গলের ডাক পড়ত। যথা, চণ্ডীদাসের পদে রাধার উক্তি- 'তোরা শ্রীমধুমঙ্গলে, ডাকহ সকলে, ভুঞ্জাও পায়েস দধি।' রাধিকার সখীদের মধ্যে এই আট জনের নাম উল্লেখ করেছি-ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, সুদেবী, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী ও তুঙ্গবিদ্যা। "রাধাতন্ত্রে'র ১৭ পটলে লিখিত আছে, রাধাকৃষ্ণের মিলনকালে ললিতা সম্মুখভাগে ও বিশাখা পূর্বদিকে দাঁড়াতেন। অপর ছয়জনের নাম গোবিন্দদাসের একটি পদে বড় সুন্দরভাবে উল্লিখিত আছে (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ২য় ভাগ ১০৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)"।[১০]

'রাখালের রাজগি' গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র সেন মূলত কৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের প্রভেদ দেখাতে চেয়েছেন। 'রাজগি' কথার অর্থ বোঝাতে তিনি বলেছেন –

'রাজগি কি?'- এই প্রশ্ন অনেকের মুখে আমায় শুনতে হয়েছে। পূর্ববঙ্গে ও হিন্দুস্তানে এই কথাটি খুবই প্রচলিত, ইহার অর্থ রাজপদ। কেউ কেউ প্রশ্ন করলেন 'রাখালের রাজপদ লিখলেন না কেন?' – উত্তরে এই বলব, বাংলা ভাষাটার

দোর-জানালা কোষে বেঁধে ফেলা উচিত নয়। পূর্ববঙ্গে যদি কোন শব্দসম্পদ থাকে, তা কি আটকে রাখতে হবে? সাহিত্যের আসরে তা স্থান পাবে না?'[১১]

পরবর্তী গ্রন্থ 'সুবলসখার কাণ্ড'-তে দীনেশচন্দ্র বৈষ্ণবীয় পঞ্চরস সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং প্রতিটি রসের অনুকূলে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় একটি কাহিনীর অবতারণা করেছেন।

প্রথমেই শান্তরস। বৈষ্ণবীয় দর্শনশাস্ত্র অনুযায়ী-

"বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ শমিনাং স্বাদ্যতাং গতঃ।
স্থায়ী শান্তিরতির্ধিরৈঃ শান্তভক্তিরসঃ স্মৃতঃ।।"

-উজ্জ্বলনীলমণী

বক্ষ্যমাণ বিভাবাদিদ্বারা সমতাসম্পন্ন ঋষিকর্তৃক যে স্থায়ী শান্তরতি আস্বাদনীয় হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে শান্তভক্তিরস বা শান্তভাব বলিয়া বর্ণনা করেন।

দীনেশচন্দ্র সেনের মতে-

> "শত বিঘ্ন দূর করে জপ বা যগের দ্বারা মনকে শান্ত করতে হবে। এই শান্তির আদর্শ হচ্ছেন বুদ্ধদেব এবং মুনিঋষিরা। বৈষ্ণবেরা সেই সব মহাত্মাদের জন্য তাঁদের ভাবরাজ্যের প্রথম সপানে এই একটা জায়গা রেখেছেন।"[১২]

দ্বিতীয়ত দাস্যরস। বৈষ্ণবীয় দর্শনশাস্ত্র অনুযায়ী-

"আত্মচিতৈ র্বিভাবাদ্যৈঃ প্রীতি রাস্বাদনীয়তাম।
নীতা চেতসি ভক্তানাং প্রীতিভক্তিরসো মতঃ।।"

ঐ

আকুল হৃদয়ে ভগবানের সেবা করিলে দাস্যভাবের সাধনা হয়।[১৩]

দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন-

> "...প্রথম সম্বন্ধ দাস্যভাব। এই অবস্থায় নীতিজ্ঞান খুব প্রবল হয়-এটা করতে নেই ইত্যাদি। দাস্যভাবের মধ্যে শান্তভাব আছে-আর এই প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধটুকু বেশী আছে।"[১৪]

তৃতীয়ত সখ্যরস। বৈষ্ণবীয় দর্শনশাস্ত্র অনুযায়ী-

"স্থায়ী ভাবো বিভাবাদ্যৈঃ সখ্যমাত্মোচিতৈরিহ।
নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রসং প্রেমানুদীর্য্যতে।।"

ঐ

(সখার উপরে, বন্ধুর উপরে যে ভালোবাসা হয়, সেইরূপ ভালোবাসার সহিত যে ভগবদ্ভজন, তাহাকে সখ্যভাব বলে।)[১৫]

দীনেশচন্দ্র সেনের মতে-

> "শান্ত ও দাস্য এইদুটি ভাবকে আত্মসাৎ করে সখ্যভাব, ভগবানের প্রতি ভক্তির রাজ্যে তাঁরা আরও একটু এগিয়ে এসেছে।"[১৬]

চতুর্থত বাৎসল্যরস। বৈষ্ণবীয় দর্শনশাস্ত্র অনুযায়ী-

"বিভাবাদৈস্তু বাৎসল্যং স্থায়িপুষ্টিমুপাগতঃ।
এষ বৎসল্যনামাত্র প্রোক্তো ভক্তিরসো বুধৈঃ।।"

ঐ

পিতামাতা প্রাণ উঘারিয়া যেমন পুত্রকন্যাকে ভালোবাসেন, সেইরূপ ভগবানকে পুত্রকন্যার ন্যায় ভালোবাসাই বাৎসল্যভাব।[১৭]

দীনেশচন্দ্র সেনের মতে-

"ছেলের মধ্যে ভগবানকে আবিষ্কার করা হচ্ছে বৈষ্ণবদের বাৎসল্যভাব।"[১৮]

পঞ্চমত মধুররস। বৈষ্ণবীয় দর্শনশাস্ত্র অনুযায়ী-

"আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং নীতা সতাং হৃদি।
মধুরাখ্যো ভবেদ্ভক্তিরসোঽসৌ মধুরা রতি।।"
ঐ

(পত্নী যেমন পতিকে ভালোবাসে, কান্তের উপর কান্তের যেমন অনুরাগ, ভগবানের উপর তেমনই ভালোবাসার নাম মধুরভাব।)[১৯]

দীনেশচন্দ্র সেনের মতে-

> "মেঘ ও বায়ু সেই প্রেমবার্তার বার্তাবহ। ফুল, চন্দ্র, কোকিলের সুর-বিশ্বের সমস্ত সঙ্গীত ও ছন্দ সেই প্রেমের স্মৃতিচিহ্ন-মাধুর্যের উৎস হয়ে দাঁড়ায়।"[২০]

আজীবন খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে থেকে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন নিজের কঠোর অধ্যবসায় এবং মেধার গুণে বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারকে ঋদ্ধ এবং উর্বর করেছেন। এরই সঙ্গে বৈষ্ণবীয় ভাব ও সংস্কৃতিকে নিজের পাথেয় করে বৈষ্ণব সাহিত্যের অমৃত ভাণ্ডারকে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় প্রান্তের মানুষের উপযোগী করে পরিবেষণ করেছেন। তাঁর এই কৃতিত্বে অংশভাগী একই সাথে আমরাও। বিপদ সঙ্কুলতার মাঝে ঈশ্বরের প্রতি অনড় ভক্তি রেখে তিনি নিজের কর্মপথে অগ্রসর হয়েছেন। সেই তাঁর সাফল্যের মূলধন।

## Reference :

১. সেন, দীনেশচন্দ্র, (১লা বৈশাখ, ১৩২৯), ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য, দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, পৃ. ৬৫
২. কবিরাজ, কৃষ্ণদাস, চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা।
৩. সেন, দীনেশচন্দ্র, তদেব, পৃ. ১১৮
৪. তদেব
৫. তদেব, পৃ. ১২০
৬. তদেব, পৃ. ১২২
৭. তদেব, পৃ. ১৪৬
৮. সেন, দীনেশচন্দ্র, (২৯শে ফাল্গুন ১৩২৬), রাগরঙ্গ, বেহালা (২৪ পরগনা), পৃ. ৪ (e-book)
৯. সেন, দীনেশচন্দ্র,কানু-পরিবাদ ও শ্যামলী খোঁজা, পৃ. ১ (e-book)
১০. সেন, দীনেশচন্দ্র, (২৯শে ফাল্গুন ১৩২৬), মুক্তাচুরি, বেহালা (২৪ পরগনা), পৃ. ৫ (e-book)
১১. সেন, দীনেশচন্দ্র, (১০ই মে, ১৯২০), রাখালের রাজগি, বেহালা(২৪ পরগনা), পৃ. ৫ (e-book)
১২. সেন, দীনেশচন্দ্র, ভূমিকা, (২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২২), সুবলসখার কাণ্ড, ৭ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলকাতা, পৃ. ১ (e-book)
১৩. স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী, তদেব, পৃ. ৫৭
১৪. সেন, দীনেশচন্দ্র, ভূমিকা, (২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২২), সুবলসখার কাণ্ড, ৭ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলকাতা, পৃ. ১ (e-book)
১৫. স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী, তদেব, পৃ. ৫৮
১৬. দীনেশচন্দ্র সেন, ভূমিকা, (২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২২), সুবলসখার কাণ্ড, ৭ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলকাতা, পৃ. ২ (e-book)
১৭. স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী, তদেব, পৃ. ৬০

১৮. দীনেশচন্দ্র সেন, ভূমিকা, (২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২২), সুবলসখার কাণ্ড, ৭ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলকাতা, পৃ. ২ (e-book)

১৯. স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী, তদেব, পৃ. ৬০-৬১

২০. সেন, দীনেশচন্দ্র, ভূমিকা, (২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২২), সুবলসখার কাণ্ড, ৭ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলকাতা, পৃ. ২ (e-book)